স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ

প্রথম খণ্ড

পিনাকী ভট্টাচার্য

horoppa

উ ৎ স র্গ

স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রথম পর্বে নানা নিপীড়ক বাহিনীর হাতে প্রাণদানকারী এবং আহত ও পঙ্গু হয়ে জীবনধারণকারী নারী-পুরুষের স্মৃতির বেদীমূলে– তাঁদের উত্তরসূরিদের দীর্ঘশ্বাসের সাথী হয়ে।

সূচি

প্রথম অধ্যায়: ১৩-৫৭
১. পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণ
২. আত্মসমর্পণের পর
৩. ভারতীয় সেনাবাহিনীর নজিরবিহীন লুটপাট
৪. স্বাধীন দেশে ভারতীয় বাহিনী

দ্বিতীয় অধ্যায়: ৫৯-৯৭
১. স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশাসনের প্রত্যাবর্তন
২. প্রবাসী সরকার ও শেখ মুজিবের প্রত্যাবর্তন

তৃতীয় অধ্যায়: ৯৯-১২১
১. রণাঙ্গন থেকে ফেরা মুক্তিযোদ্ধারা
২. বীরাঙ্গনা

চতুর্থ অধ্যায়: ১২৩-১৪১
১. জহির রায়হানের অন্তর্ধান
২. ভিত্তিহীন তথ্য, উপাত্তহীন অমীমাংসিত 'সত্য'
৩. মুক্তিযুদ্ধের বীরত্ব পদক

পঞ্চম অধ্যায়: ১৪৩-১৫৯
১. দালাল গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ আর বিচার
২. সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা

ষষ্ঠ অধ্যায়: ১৬১-১৭৯
সংবিধান প্রণয়ন

সপ্তম অধ্যায়: ১৮১-২১৭
শেখ মুজিবের প্রশাসন

অষ্টম অধ্যায়: ২১৯-২২৫
প্রতিরক্ষাবাহিনী

নবম অধ্যায়: ২২৭-২৩৭
বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা

দশম অধ্যায়: ২৩৯-২৫৩
স্বাধীন দেশের স্বীকৃতি, পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং ওআইসি সম্মেলন

এগারো অধ্যায়: ২৫৫-২৬৭
১৯৭৩-এর নির্বাচন: রক্তাক্ত বিজয় উদ্‌যাপন

বারো অধ্যায়: ২৬৯-২৮১
রাজনৈতিক নিপীড়ন

তেরো অধ্যায়: ২৮৩-২৯৭
সিরাজ শিকদারের হত্যাকাণ্ড

চোদ্দ অধ্যায়: ২৯৯-৩২৯
১. রক্ষীবাহিনী
২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাত খুন

পনেরো অধ্যায়: ৩৩১-৩৪৯
ছাত্রলীগের ভাঙন ও জাসদের জন্ম

ষোলো অধ্যায়: ৩৫১-৩৫৭
বাংলাদেশ-ভারত ২৫ বছরের চুক্তি

সতেরো অধ্যায়: ৩৫৯-৩৬৭
ফারাক্কা ব্যারেজ: বাংলাদেশের মরণবাঁধ

আঠারো অধ্যায়: ৩৬৯-৩৮৩
বন্ধুর পার্বত্য চট্টগ্রাম

উনিশ অধ্যায়: ৩৮৫-৪০১
'৭৪-এর দুর্ভিক্ষ

বিশ অধ্যায়: ৪০৩-৪১৩
তাজউদ্দীনের বিদায়

একুশ অধ্যায়: ৪১৫-৪৪৫
বাকশাল

বাইশ অধ্যায়: ৪৪৭-৪৮৮
শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ড

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ
পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণ

'বেদনাদায়ক হলেও বাংলার এই বিভাজন ছিল অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য।'[১৫]

ভালো হতো, যদি আমাদের শাসকেরা সময়মতো এটা উপলব্ধি করে ভারতের হাতে এর অস্ত্রোপচারের দায়িত্ব না দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বাঙালিদের চলে যেতে দিত।'[১৫]

এক

১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর, সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। ঢাকার অদূরে ডেমরায় কিছুক্ষণ আগেই সূর্যোদয় হয়েছে। শীতের কুয়াশাভেজা সকাল। আঁধার তখনো ভালোভাবে কাটেনি। দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় ৮০০ সৈনিকের সঙ্গে তিন নম্বর সেক্টরের আরো কিছু মুক্তিযোদ্ধা সমবেত হয়েছেন। কাকডাকা এই শিশিরসিক্ত শীতের ভোরে, আধো-আলো-অন্ধকারে ঢাকার দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের এই দলটির মার্চ করে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। এরমধ্যেই খবর এসেছে, পাকিস্তানি বাহিনী মিত্রবাহিনীর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে।

যদিও তখন পর্যন্ত জেনারেল নিয়াজি নিজে থেকে আত্মসমর্পণের কোনো ঘোষণা দেননি কিংবা মিত্রবাহিনীর সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ নিয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক আলোচনাও হয়নি। তবু পাকিস্তানি বাহিনীর পরাজয় যে অবধারিত সেটা সকলের মনেই বদ্ধমূল ছিল। সকলের মধ্যেই বিজয়ের আনন্দের এক অনির্বচনীয় অনুভূতি। মুক্ত ঢাকায় প্রবেশের উত্তেজনায় যেন টগবগ করে ফুটছে মুক্তিযোদ্ধারা। একে অন্যকে জড়িয়ে ধরছে, অনেকের চোখেই আনন্দাশ্রু। নয় মাসের মরণপণ লড়াই তাহলে শেষ হলো!

হঠাৎ তারা লক্ষ্য করলেন, ঘন কুয়াশার বুক চিরে একটা সামরিক জিপ আসছে পূর্ব দিক থেকে। সতর্ক হয়ে জিপটিকে লক্ষ্য করতে থাকলেন সবাই। জিপ একটাই, আর সেটা নির্ভয়ে আসছে দেখে সবাই ধরেই নিলেন এটা মিত্রপক্ষীয় সামরিক যান। আরো কাছে আসতেই দেখলেন, তাদের অনুমান নির্ভুল। জিপে ভারতীয় বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং, বেসামরিক পোশাকে পাকিস্তান আর্মির স্পেশাল কমান্ডো ব্যাটালিয়নের মুক্তিযোদ্ধা মেজর হায়দারকে পাশে বসিয়ে ঢাকার দিকে যাচ্ছেন। এই দু'জন বিজয়ী বীর ইতিহাসের সাক্ষী হতে জেনারেল নিয়াজির আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। কিছুক্ষণ পরে দু'জনেই বিজয়ীর বেশে ঢাকায় প্রবেশ করবেন। শত্রুর সঙ্গে এই যুদ্ধে বিজয়ী হলেও কে জানতো এর কয়েক বছর পরেই এই দুই বীর নিজ নিজ দেশে সহযোদ্ধাদের হাতে সামরিক অভিযানেই নিহত হবেন। নিয়তি নির্ধারণ করে রেখেছিল, মেজর হায়দার নিহত হবেন ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বর জেনারেল খালেদ মোশাররফের সঙ্গে, আর সাবেগ সিং নিহত হবেন ১৯৮৪ সালে স্বর্ণমন্দিরের ভেতরে শিখ সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা জারনাইল সিং ভিন্দ্রানওয়ালের সঙ্গে। জেনারেল সাবেগ সিং অবসর নেবার পর ভিন্দ্রানওয়ালের সামরিক উপদেষ্টা হয়েছিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে, বিজয়ী বীরদের উপাখ্যানের সঙ্গে, তাদের এ ট্র্যাজিক মৃত্যুর শর্তও কি লেখা ছিল?

ঢাকা নগরী রক্ষার জন্য পাকিস্তানিদের কোনো সুসংগঠিত বাহিনী ছিল না। আত্মসমর্পণের আগে পদাতিক, প্রকৌশল, অর্ড্‌ন্যান্স, সিগন্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও সার্ভিস কোর নিয়ে মোট ফোর্স ছিল বারো কোম্পানি। এ ছাড়া প্রায় ১৫০০ ইপিসিএএফ, ১৮০০ পুলিশ এবং ৩০০ রাজাকার ও আল্-বদর মিলে পাকিস্তানের পক্ষে মোট সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। এই সৈন্যদের যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। তারা নিজ নিজ পজিশনে স্থবির-নিশ্চল দাঁড়িয়েছিল এবং ছোট্ট একটা চাপেই ভেঙে পড়ার জন্য প্রস্তুত ছিল।[১]

ক্যান্টনমেন্ট বাদে বাকি ঢাকা শহরের রক্ষার দায়িত্ব ছিল পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার বশীরের ওপর। ১৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় তিনি জানতে পারেন, মিরপুর সেতু অরক্ষিত অবস্থায় আছে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ফোর্স একত্রিত করে এক কোম্পানি সৈন্য দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর সকালের দিকে মেজর সালামতকে তিনি মিরপুর ব্রিজের সুরক্ষার জন্য পাঠান। এদিকে ১৬ ডিসেম্বর সকালেও মিরপুর সেতু অরক্ষিত অবস্থায় আছে– এই খবরটা মুক্তিবাহিনীর মাধ্যমে পৌঁছে যায় ভারতীয় কমান্ডো বাহিনীর কাছে। খবর পেয়ে তারা সকাল হবার কিছু আগেই ঢাকার দিকে রওয়ানা হন। এদের পৌঁছানোর আগেই মেজর সালামত মিরপুর ব্রিজে অবস্থান নিয়ে নেন। ফলে সেখানে পৌঁছে কমান্ডো বাহিনী প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। এই কমান্ডো দলকে অনুসরণ করে পেছনে আসছিলেন ১০১ কমিউনিকেশন জোনের জেনারেল নাগরা। তাদের অগ্রযাত্রা থেমে গেল সেতু থেকে কিছু দূরে। জেনারেল নাগরার বাহিনীর সাথে ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকী স্বয়ং এবং 'কাদেরিয়া বাহিনী'র চৌকস মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অগ্রবর্তী দল।

জেনারেল গান্ধর্ব সিং নাগরা আর জেনারেল নিয়াজি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মিতে কোর্সমেট ছিলেন, একসঙ্গে কমিশন পেয়েছিলেন এবং দু'জন দু'জনের বন্ধু ছিলেন। নাগরা নিয়াজিকে 'আব্দুল্লাহ' বলে ডাকতেন। আজ ভাগ্যের পরিহাসে দুই বন্ধু যুদ্ধরত দুই শিবিরে। এক বন্ধু পরাজিত, আরেক বন্ধু কিছুক্ষণের মধ্যেই বিজয়ীর বেশে নগরে ঢুকবেন। নাগরা মিরপুরে আমিনবাজার ব্রিজের ওপার থেকে নিয়াজিকে যে চিঠি লিখেছিলেন সেটি ছিল কোনো বন্ধুর কাছে লেখা বন্ধুর চিঠি। লিখেছিলেন: প্রিয় আব্দুল্লাহ, আমি এখানে এসেছি, তোমার খেলা শেষ। আমি পরামর্শ দিচ্ছি– আমার নিরাপত্তায় চলে আসো, আমি তোমার বিষয়টা দেখবো। তোমার প্রতিনিধি পাঠাও।

সকাল ন'টায় চিরকুটটা জেনারেল নিয়াজির হাতে আসে। সেই সময় তার পাশে ছিলেন মেজর জেনারেল জামশেদ, মেজর জেনারেল রাও ফরমান ও রিয়ার এডমিরাল শরিফ। মেজর জেনারেল রাও ফরমান নিয়াজিকে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার কোনো রিজার্ভ বাহিনী আছে? জেনারেল নিয়াজি নিরুত্তর। রিয়ার এডমিরাল শরিফ পাঞ্জাবিতে কথাটা অনুবাদ করে বললেন: 'কুজ পাল্লে হ্যায়?' (থলেতে কিছু কি আছে?)। নিয়াজি বৃহত্তর ঢাকার রক্ষক জেনারেল জামশেদের দিকে তাকালেন। জেনারেল জামশেদ মুখে কিছু না বলে এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন, যার অর্থ হলো– কিছুই নেই, শূন্য। ফরমান আর শরিফ তখন একসঙ্গে বলে ওঠেন: যদি এ-ই হয়, তাহলে যান, যা সে (নাগরা) করতে বলে তা করেন গিয়ে। জেনারেল নিয়াজি জেনারেল নাগরাকে অভ্যর্থনা

জানানোর জন্য জেনারেল জামশেদকে পাঠালেন।[২]

দুই

ঢাকা শহরের মতিঝিলে পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ (পি অ্যান্ড টি) কলোনি। টেলিগ্রাফের বিহারি প্রকৌশলী ইমতিয়াজ আলম খানের সরকারি ফ্লাটে দূর থেকে ফজরের আজানের শব্দ ভেসে আসছে– আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান নাউম। আজানের শব্দ ভেদ করে দরোজায় উত্তেজিত করাঘাত। ইমতিয়াজ আলম খান দরোজা খুলে দিতেই দেখলেন বাঙালি প্রতিবেশী মুহাম্মদ আলী খান মাল্লুর উত্তেজিত চেহারা । মাল্লু সাহেব ধীর-স্থির মানুষ, কিন্তু আজকে তার চেহারা উত্তেজনায় টগবগ করছে।

ইমতিয়াজ তুমি খবর শুনেছ?

কী খবর, মাল্লু ভাই?

'আকাশবাণী' থেকে বলছে, পাকিস্তানি আর্মি আজ সারেন্ডার করবে।

হো হো করে হেসে উঠে ইমতিয়াজ আলম খান বললেন:

মাল্লু ভাই, আপনি 'আকাশবাণী'র কথা বিশ্বাস করেন?

তখন ইমতিয়াজ আলম খান ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি, এটাই তার শেষ হাসি হতে যাচ্ছে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার জীবন ওলট-পালট হয়ে যাবে।

আরে না, বের হয়ে দেখ, খুব নিচু দিয়ে ইন্ডিয়ান বিমান উড়ে যাচ্ছে, পাকিস্তানি আর্মির এন্টি-এয়ারক্রাফ্‌ট্‌ গানগুলো কোনো গুলিই ছুঁড়ছে না।

ইমতিয়াজ আলম খানের শিরদাঁড়া দিয়ে ঠাণ্ডা রক্তস্রোত বয়ে গেল। মুখটা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে বললেন:

মাল্লু ভাই, এটা কীভাবে সম্ভব? ইন্ডিয়ান আর্মি তো ঢাকা পর্যন্ত এখনো পৌঁছতে পারেনি। আর কার কাছেই-বা নিয়াজি সারেন্ডার করবে?

ইমতিয়াজ আলম খানের এই শীতল জবাব মুহাম্মদ আলী খান মাল্লুকে তৃপ্ত করতে পারলো না, বিড়বিড় করতে করতে বাসায় ফিরে গেলেন তিনি।

এরপর আর বিছানায় যাওয়া হয়নি ইমতিয়াজের। বার বার বারান্দায় গিয়ে দিগন্তে চেয়ে থাকছেন। কী যেন খুঁজছেন। অবশেষে সকাল দশটার দিকে

সেই প্রতীক্ষিত আতঙ্ক– বজ্রনিনাদে উড়ে এলো খুব নিচু দিয়ে– ভারতীয় ফাইটার জেট। এত নিচে যে, পাইলটের চেহারা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। নিচ থেকে কোনো গুলি নেই, কুণ্ডলি পাকিয়ে ধোঁয়া নেই, বোমাবর্ষণ নেই। কিন্তু প্লেনের পেটের ভেতর থেকে অসংখ্য টুকরো কাগজ উড়ে এলো, ঢাকার আকাশ ছেয়ে গেল লিফ্‌লেটে। বাংলা, ইংরেজি আর উর্দুতে লেখা পাকিস্তানি বাহিনীকে 'আত্মসমর্পণের আহ্বান'।[৩]

তিন

ঠিক সাড়ে ন'টায় মিরপুর ব্রিজের দিক থেকে ঝড়ের গতিতে ছুটে আসা গাড়ির গর্জন শুনে মিরপুর ব্রিজের পশ্চিম প্রান্তে মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। পরক্ষণেই মাটি কাঁপিয়ে কয়েক ঝাঁক গুলির শব্দ। চার-পাঁচটি মেশিনগান একসঙ্গে বিকট শব্দে গর্জে উঠে থেমে যায়। চকিতে ঘটে যাওয়া ঘটনার পর আবার থমথমে নীরবতা। গুলি ছুড়তেই দ্রুত ধেয়ে আসা গাড়ি দু'টি নিশ্চল হয়ে যায়। মিত্রবাহিনীর ভুল ভাঙে। গাড়ি দু'টি শত্রুর নয়, মিত্রবাহিনীর। গাড়িতে কোনো সাদা পতাকা বা কাপড় না থাকায় শত্রু ধেয়ে আসছে ভেবে মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা গুলি ছুড়েছিল।

পাকিস্তানি হানাদাররা আত্মসমর্পণ করছে– এই দারুণ সুখবরটি পৌঁছে দিতে ঝড়ের বেগে ছুটে আসছিল ওরা। আসার পথে আনন্দের আবেশে কখন গাড়িতে সাদা পতাকার বদলে লটকানো সাদা জামাটি প্রচণ্ড বাতাসে উড়ে গেছে তা তারা জানতেও পারেনি। ভুল যখন ভাঙলো তখন যা হবার হয়ে গেছে। তিনজন সঙ্গে সঙ্গে শহিদ। আমিনবাজার স্কুলের পাশে দু'টি জিপই নিশ্চল হয়ে আছে। একটিতে তিনজনের মৃতদেহ। রক্তে জিপটা ভেসে গেছে। তখনও রক্ত ঝরছে।

এত যন্ত্রণার মাঝেও আহত একজন জিপের স্টিয়ারিং ধরে বসেছিল। দারুণ সুখবরটা যত তাড়াতাড়ি দিতে পারবে, ততই যেন সহযোদ্ধা হারানোর দুঃখ ও গুলিতে আহত হওয়ার নিদারুণ যন্ত্রণার উপশম হবে। আহত যোদ্ধার গলার স্বর জড়িয়ে আসা সত্ত্বেও যতদূর সম্ভব প্রত্যয় মেশানো কণ্ঠে বিজয়ীর ভঙ্গিতে বললো: শত্রুরা আত্মসমর্পণে রাজি। তাদের দিক থেকে এখনই কোনো জেনারেল আসছে।

যে মিত্রসেনা এই সংবাদ দিলো, তার হাঁটুর নিচের অংশ বুলেটে এফোঁড়-

ওফোঁড় হয়ে গেছে। তিনি তার ক্ষতস্থান দু'হাতে চেপে ধরে সর্বশেষ সংবাদ দিলেন। দুই হাজার বছর আগের ইতিহাস যেন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে ও ভিন্ন পটভূমিতে জীবন্ত হয়ে উঠল। ম্যারাথন থেকে এথেন্স নয়, ঢাকা থেকে মিরপুরে গুলিবিদ্ধ যন্ত্রণাক্লিষ্ট দেহের দ্রুত নিঃশেষিত শক্তি শেষবারের মতো একত্র করে শত্রুর আত্মসমর্পণ তথা, পূর্ণ বিজয়ের দারুণ সংবাদ দিলেন এ যুগের বীর সেনানী, এই শতাব্দীর ফিডি পাইডিস।

আহত ও নিহতদের সরিয়ে নেয়ার জন্য হেলিকপ্টার আনা হলো। হেলিকপ্টার আমিনবাজার স্কুলের পাশে পাকা বাড়ির সামনে মসজিদের মাঠে নামিয়ে আহত ও নিহতদের উঠিয়ে দেয়া হলো। হেলিকপ্টার মির্জাপুর হাসপাতালের উদ্দেশে উড়ে যাবার কয়েক মিনিট পর ঢাকার দিক থেকে মার্সিডিজ বেন্‌জ্ জিপে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর একজন মেজর জেনারেল, দু'জন লে. কর্নেল, একজন মেজর, দু'জন ক্যাপ্টেন ও কয়েকজন সিপাহী আত্মসমর্পণের আনুষ্ঠানিক পর্ব সারতে এলো।

হানাদারদের পক্ষ থেকে সিএএফ প্রধান মেজর জেনারেল জামশেদ আত্মসমর্পণের প্রথম পর্ব সারতে আসেন। মিত্রবাহিনী যথারীতি সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালো। মেজর জেনারেল নাগরার বামে ব্রিগেডিয়ার সানসিং, তারপর ক্লের, সবশেষে কাদের সিদ্দিকী। জেনারেল সামরিক অভিবাদন জানিয়ে কোমর থেকে রিভল্‌ভার বের করে প্রসারিত দুই হাতে নাগরার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। মেজর জেনারেল নাগরা বুলেট রেখে রিভল্‌ভারটি জামশেদকে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর আগের মতো দুই প্রসারিত হাতে তার টুপি দিলেন। নাগরা লাইন থেকে বেরিয়ে জামশেদের টুপিটি কাদের সিদ্দিকীর হাতে দিলেন। 'জেনারেল ফ্ল্যাগ' নাগরার হাতে দিলে সেটা তিনি ব্রিগেডিয়ার সানসিং-কে দিলেন। জেনারেল জামশেদ সবশেষে তার কোমর থেকে বেল্ট খুলে দিলে নাগরা তা ব্রিগেডিয়ার ক্লেরকে দেন। তিনি সাময়িকভাবে ব্যবহারের জন্য জামশেদকে আবার তা ফিরিয়ে দেন। মেজর জেনারেল নাগরার গাড়ি থেকে যৌথবাহিনীর জেনারেল ফ্ল্যাগ খুলে তা পাকিস্তানি বাহিনীর মার্সিডিজ বেন্‌জে লাগিয়ে জামশেদকে নিয়ে সকলে অবরুদ্ধ ঘাঁটির দিকে এগোলেন।

যৌথবাহিনীর 'জেনারেল ফ্ল্যাগ' উড়িয়ে মার্সিডিজ বেন্‌জ্ সকাল ১০টা ৫ মিনিটে নিয়াজির ১৪তম ডিভিশন সদর দপ্তরের সামনে এসে দাঁড়ায়।[৪] কর্নেল মেহতা এবং একজন পাকিস্তানি অফিসারকে পাঠানো হয় টঙ্গীতে। তাদের হাতে ছিল সাদা পতাকা। কিন্তু একটা ট্যাংকের গোলা এসে আঘাত করে তাদের জিপে। জিপের আরোহী চারজনই নিহত হন। টঙ্গীতে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ শেষ হয়েছিল

বিকেল চারটার দিকে।[৫] জেনারেল নাগরা কয়েকজন সৈন্য নিয়ে ঢাকায় প্রবেশ করলেন সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে। তিনি ঢুকলেন গৌরবের শিরোপা ধারণ করে। জেনারেল নিয়াজির অধিকৃত ঢাকার পতন ঘটলো ঠিক তখনই।[৬]

চার

সকাল নয়টা, 'সাকুরা' রেস্টুরেন্টের সামনে ও পাশের গলিতে মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটা দল জড়ো হয়েছে। বর্তমান কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ধরে দলে দলে পাকিস্তানি আর্মি হেঁটে ক্যান্টনমেন্টে ফিরে যাচ্ছে। তাদের বাম হাতের বাজুতে সাদা কাপড় বাঁধা। আত্মসমর্পণের আগে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পাকিস্তানি বাহিনীর অবশিষ্ট অংশকে একত্রিত করার জন্যই তাদের ক্যান্টনমেন্টে নেয়া হচ্ছে। কে বলবে এই বিষণ্ন, ভীত এবং নতমুখ সেনারাই গত সাড়ে নয় মাস ধরে অবর্ণনীয় বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল সোনার বাঙলায়। এদের সবার হাতেই রক্তের দাগ।

১১টার দিকে শাহবাগের দিক থেকে কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ধরে ধীর গতিতে আর্মির একটি কনভয় এগিয়ে এলো। কনভয়ের প্রথম জিপটিকে আমরা কাকডাকা ভোরে ডেমরা থেকে ঢাকার দিকে আসতে দেখেছি। সেই জিপে আছেন ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং আর মেজর হায়দার। কনভয়টি ডানে মোড় নিয়ে বিজয়ীর বেশে নিউট্রাল জোন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে এসে দাঁড়ালো। মেজর হায়দার আর সাবেগ সিং অগ্রবর্তী দল নিয়ে ঢাকায় পৌঁছেছেন। তাদের মূল দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা করা। ধীরে ধীরে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল এলাকায় মিত্রবাহিনী আর মুক্তিবাহিনীর সংখ্যা বাড়তে থাকলো। মুক্তিযোদ্ধারা এর মধ্যেই শাহবাগে 'রেডিও পাকিস্তান' ভবন থেকে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে। অবরুদ্ধ ঢাকায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। রাজপথে উৎফুল্ল জনতা মিত্রবাহিনী আর মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে কোলাকুলি করছে।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটা বড় দল 'সাকুরা'র সামনে দিয়ে হেঁটে ক্যান্টনমেন্টের দিকে যাচ্ছিল। এমন সময় উৎসাহী জনতা তাদের ঘিরে ধরলো প্রবল উত্তেজনায়। সবাই চিৎকার করে তাদের উদ্দেশ করে বলতে লাগলো: বল শালারা, 'জয় বাংলা'!